জীবন উন্নয়নের সন্ধানে

প্রবন্ধ সংকলন

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

আকাশের অর্ধেক এখনও অন্ধকার	১৫
সবার জন্য চাই পুষ্টি	২০
শ্রমজীবীদের পুষ্টি	২৭
ব্যক্তি প্রচেষ্টার মূল্যও কম নয়	৩২
ম্যালেরিয়া বনাম মানুষ	৩৪
শরীরের ক্ষয় জীবনের অবক্ষয়	৪৪
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী	৪৮
শিশুশিক্ষা কোন পথে	৫৫
স্কুলছুট কেন	৬০
নিরক্ষরদের চোখে সমাজ	৬৫
শিশুশিক্ষা ও পুষ্টি	৬৯
মিড ডে মিলকে ঘিরে সমস্যা ও সম্ভাবনা	৭৫
উন্নয়ন কী ভেবে ও কী ভাবে	৮৬
অপরাধী কে	৯১
নববর্ষের বার্তা	৯৫

ভূমিকা

এপ্রিল ২০০৪— চার বছর আগের কথা। ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'জীবনের সন্ধানে' প্রকাশ হতে চলেছে। অনুরোধ এল সংকলনের উপক্রমণিকা রচনার। পরিচিত হলাম ডাক্তারবাবুর চিন্তাধারার সঙ্গে। স্বেচ্ছাব্রতী সমাজসচেতন এক চিকিৎসকের অসাধারণ অভিজ্ঞতাজাত চিন্তাভাবনা। তার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। লেখকের লেখনী অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে। রাজ্যে সামাজিক পরিবেশ দ্রুত পালটে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নী অর্থনীতির প্রভাবে এই সমাজ প্রতিনিয়ত জীর্ণ হচ্ছে নানান সমস্যা, দ্বন্দ্ব আর সংঘাতে। কিন্তু সমাজ এখনও আবর্তিত হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাকে ভিত্তি করেই — অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান— এককথায় জীবনযাপনের সনাতনী উপাদান।

আজ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে— ব্যক্তিমানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে আলাদা হয়ে এই সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। তাকে সামাজিক সমস্যা নিয়ে ভাবতেই হবে। প্রতিটি প্রশ্নে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ডা. মুখোপাধ্যায় জনসাধারণের মৌলিক সমস্যাগুলি উপজীব্য করেই লিখে চলেছেন একের পর এক ছোটো বড়ো নানান প্রবন্ধ। ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চারটি গুচ্ছে এগুলি বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

এক, জনস্বাস্থ্য ও জনপুষ্টি
দুই, জনশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা
তিন, স্কুলে মিড ডে মিল
চার, উন্নয়নের পথসন্ধান

মানবসমাজের অস্তিত্ব আজ পুরোপুরি নির্ভর করছে এই গ্রহের প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার ওপর। পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গে অর্থবহ ধারণা হল জনস্বাস্থ্য। জনস্বাস্থ্য এক নতুন তাৎপর্য বহন করছে। এটি এখন নাগরিক বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

জনপুষ্টি ধারণাটি অভিনব হলেও এটি জনস্বাস্থ্যেরই পরিপোষক। পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী সমাজের স্বল্পবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া বৃহত্তম সমাজে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনেরই অন্যতম কর্মসূচি। এই সংকলন গ্রন্থে জনপুষ্টি শীর্ষক প্রবন্ধগুলি গণআন্দোলনের কর্মীদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের হাতিয়ার হতে পারে। গ্রামীণ সমাজে যেখানে সরকারি পরিষেবা এখনও পৌঁছায়নি সেখানে সমাজকর্মীদের, স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেক দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। শিশুবিকাশ কেন্দ্রগুলিতে সহায়িকাদের কাছে জনপুষ্টির বাস্তবজ্ঞান স্থানীয় মহিলা সমাজে এক যোগ্য ভূমিকার সন্ধান দেবে।

স্কুলে পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের সঙ্গে পুষ্টির প্রশ্নটি উত্থাপন করার স্তর থেকে বয়স্ক তথা শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত নারী-পুরুষের পুষ্টির প্রশ্নে পৌঁছানো এক স্বতঃসিদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ। সাধারণের দৈনন্দিন খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের আলোচনাকে ডাক্তারবাবু গণআন্দোলনেরই অঙ্গ হিসাবে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁকে একজন খাদ্য বিশেষজ্ঞের ভূমিকায়

অবতীর্ণ হতে হয়েছে। বোঝা দরকার একজন গণআন্দোলনের কর্মীকে কত দিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত ও সমৃদ্ধশালী করতে হয়।

এই আপাত 'নিরামিষ' আলোচনা থেকে লেখক উঠে এসেছেন এক ব্যাপকতর সামাজিক সমস্যায়। আজ সরকারি স্তরেই স্বীকৃত হয়েছে দেশবাসীর প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজনেরই দৈনিক আয় ২০ টাকার বেশি নয়। অনশন বা অর্ধাহার যেখানে বাস্তব ঘটনা, সেখানে পুষ্টির আলোচনা কি নিছক আকাশকুসুম? লেখকের বক্তব্য, ক্ষুধার নিরসন এবং পুষ্টির সমস্যা বিচ্ছিন্ন নয়। দেশের সুশীল সমাজ ও নির্বাচিত প্রগতিশীল সরকারকে বারবার মনে করাতেই হয় তাদের জরুরি দায়দায়িত্বের কথা। আরও একটি কথা, সমাজের সকল অংশকেই স্মরণে রাখতে হয় খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে। আমাদের মতো দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দেশে অনশন ও অর্ধাহার নিছক পোশাকি আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, প্রসঙ্গটি একান্তই বাস্তব। তাই এ দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য যেন সরে না যায়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মিড ডে মিল সব আলোচনার কেন্দ্রভূমি অবশ্যই সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ধারাবাহিক উন্নয়ন ছাড়া আজ কোনও জনপ্রিয় সরকার চলতে পারবে না। একবিংশ শতাব্দীর জনমানসে সামগ্রিক উন্নয়ন গণচেতনার এক অনিবার্য স্তর।

উন্নয়নের সমস্যা আলোচনায় ডা. মুখোপাধ্যায় আরও একটি বক্তব্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন তা হল সাধারণ মানুষের সমবায়িক প্রচেষ্টার গুরুত্ব ও অনিবার্যতায়। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্যটি এই ভাবেই তুলে ধরেছেন— "সমাজে যে অগণিত বেকার ও অর্ধবেকার দরিদ্র মানুষজন আছেন তাদের আত্মমর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান হবে কী ভাবে? 'বাজার'-এর দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া কি এদের আর কোনও গতি নেই? অসংগঠিত গরিব মানুষ শুধু নির্ধনই নয়, মানসিক ভাবেও দীন। সমবায়ের মধ্য দিয়েই দরিদ্র মানুষ ফিরে পেতে পারে তার আত্মশক্তি ও ভরসার জায়গা।"

এর পর তিনি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন : "সমবায়ই পারে মানুষকে 'বাজার'-এর কাছে হার না মেনে নিজেদের জীবনের মান উন্নয়ন ঘটাতে। তবে সমবায় গঠনের জন্য চাই গণজাগরণ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নতুনভাবে নতুন পরিস্থিতিতে সমবায় আন্দোলনই উন্নয়নের দিশা দেখাতে পারে। সরকার এই আন্দোলনের সহযোগী হতে পারে মাত্র।"

সমাজসচেতন, মানবতাবাদী, সমসাময়িক যুগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এক জিজ্ঞাসু মন জীবনযাপনের নানান সমস্যার স্বচ্ছ উত্তর সন্ধানে সদাই রত। তাঁর আন্তরিক উপলব্ধির কল্যাণে তিনি পাঠকপাঠিকাদেরও ভাবাচ্ছেন সেই সব প্রশ্নের উত্তরের। আত্মজিজ্ঞাসার এই পরিক্রমাই ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের গভীর লেখনীর মূল তাগিদ। এই তাগিদ ছড়িয়ে পড়ুক পাঠকপাঠিকাদের জনমানসে।

কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যক্ষ হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং
(বি-এড) কলেজ এবং প্রাক্তন
প্রধান ও অধ্যাপক, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা বিভাগীয় ও
প্রশিক্ষণ পরিষদ (এস.সি.ই.আর.টি.) পশ্চিমবঙ্গ

অগাস্ট ২০০৮
বেণুবন আবাসন
৯৩/২ কাঁকুলিয়া রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

লেখকের কথা

মানুষের ন্যূনতম চাহিদার প্রাথমিক শর্ত— স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সক্ষমতা অর্জন এবং সম্মানজনক জীবিকা।

অথচ বিশ্বের অগণিত মানুষ আজও ক্ষুধার্ত। ভারতবাসীও এই বঞ্চনার বাইরে নয়। এর থেকে মুক্তি পেতেই মানুষের জানা অজানার পথে চলা।

মা ও সন্তানের জীবনবৃত্ত রক্ষার মধ্য দিয়েই মানবজীবনের ধারা অবিরাম প্রবাহিত হয়। এই জীবনবৃত্তের অন্যতম অংশীদার কন্যা সন্তান। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে লেখা— 'আকাশের অর্ধেক এখনও অন্ধকার।'

জীবনরক্ষার প্রাথমিক উপাদান পুষ্টি। পুষ্টিকর আহার গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষ শক্তি অর্জন করে। এই শক্তি তাকে কর্মক্ষমতা দেয়। সে কারণে 'সবার জন্য চাই পুষ্টি' ও 'শ্রমজীবীদের পুষ্টি' সংকলনে স্থান পেয়েছে।

মিড ডে মিলকে ঘিরে গরিব শ্রমজীবী মানুষের কৌতূহল আছে। যেসব ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ করবে তাদের অভিভাবকেরা জানতে ইচ্ছুক মাধ্যমিক স্কুলে মিড ডে মিল চালু হয়েছে কি না? কারণ মাধ্যমিকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল চালু করা সরকারের গৃহীত নীতি। সে কারণে মিড ডে মিলের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। এছাড়াও মিড ডে মিলকে ঘিরে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলিরও আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। লেখকের পূর্ব প্রকাশিত 'জীবনের সন্ধানে' গ্রন্থে মিড ডে মিল সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মিড ডে মিলের গুরুত্ব অনুধাবন করে পুনরায় এ বিষয়ে একটি বিশদ লেখা সংকলনে রাখা বিবেচিত হয়েছে।

অপুষ্টি, অশিক্ষা এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি রাষ্ট্রের দায়সারা মনোভাবের ফলে আমাদের দেশের মানুষ এখনও সংক্রামক ব্যাধির মহামারী থেকে উদ্ধার পায়নি। যক্ষ্মা রোগ এর অন্যতম। 'শরীরের ক্ষয় জীবনের অবক্ষয়' লেখায় এরই অভিব্যক্তি।

ম্যালেরিয়ার পুনরুত্থান চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ম্যালেরিয়া বনাম মানুষ' সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা।

স্বাস্থ্যের সক্ষমতা অর্জনের তাগিদে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা হল শিক্ষায় সক্ষমতা অর্জন। শিশুশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষায় সক্ষমতার বুনিয়াদ তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটেই লেখা 'শিশুশিক্ষা কোন পথে' ও 'স্কুলছুট কেন' এবং 'নিরক্ষরদের চোখে সমাজ।'

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকার একটি ধারাবাহিক চিত্র 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

সমাজজীবনে সম্মানজনক জীবিকা মানুষকে সুন্দর জীবন গড়ার সুযোগ করে দেয়। জীবিকার প্রশ্নে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি আমাদের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। এই প্রশ্নগুলিকে ঘিরে 'উন্নয়ন কী ভেবে ও কী ভাবে' লেখাটি উপস্থিত করা হয়েছে।

আজও যেভাবে পৃথিবীর পরিবেশ আক্রান্ত হচ্ছে মানবজীবনই হয়তো বিলুপ্তির পথে। এক দিকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং এরই পরিপূরক ভোগ-সর্বস্বতা আমাদের আত্মহননের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই 'অপরাধী কে' ও 'নববর্ষের বার্তা' দিয়েই গ্রন্থের সমাপ্তি।

দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকায় কখনও নিজের নামে কখনও 'বদ্যিনাথ' নামে বেশিরভাগ প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকা লেখার দায়িত্ব প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্রী কমলকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করাতে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রথম প্রজন্মের শিশু-শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সক্ষমতা অর্জনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে তাঁর ভাবনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর সুপরামর্শে শিশুশিক্ষার ওপর প্রবন্ধগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ শ্রী নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রতিটি লেখার উৎকর্ষ বাড়াতে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন। এর জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সুকুমারীদি (শ্রীমতী সুকুমারী ভট্যাচার্য) আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমার লেখাগুলি দেখে দেওয়া থেকে বইটির প্রকাশনা পর্যন্ত আমাকে সব দিক থেকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কবি শঙ্খ ঘোষ বইয়ের লেখা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেজন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রী শুভেন্দু দাশগুপ্তর লেখা আমার ভাবনাকে আলোড়িত করে। তাঁকে আমার লেখা প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করাতে দ্বিধাহীনভাবেই তিনি রাজি হয়েছেন। তাঁর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী সমীর আইচ-কে। ভালোবেসে যিনি বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন।

শ্রী সুবিমল লাহিড়ী আমাদের প্রতিবেশী। সেজন্য আমরা গর্বিত, তিনি খুবই নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বই প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমি প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক-এর নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অবশেষে বাড়ির সবার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার বাউন্ডুলেপনাকে সহ্য করার জন্য।

আকাশের অর্ধেক এখনও অন্ধকার

অমর্ত্যর মর্ত্যসাধনা সিদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়। এখানে আপামর জনগণের আত্মোন্নতির ইচ্ছা প্রকাশই এই যজ্ঞের হবি বা ঘৃত।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে ২৬শে জানুয়ারি ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। যে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য প্রজাগণের কল্যাণসাধন। ভারতের কমুনিস্ট পার্টি সে সময় বারবারই বজ্রকণ্ঠে এই আওয়াজ তোলার চেষ্টা করেছে , এ রাষ্ট্র প্রজাদের কল্যাণে নয় বরং ধনীদের ধন বৃদ্ধিতে অধিক উৎসাহী।

এই আওয়াজের সঙ্গে সুর মেলাতে প্রজাদের কতটা সায় ছিল বা আছে সে সম্পর্কে লেখক এখনও সন্দিহান। সে কারণে আজও রাষ্ট্রের সংবিধানে 'স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার' বলে স্বীকৃত হয়নি। ফলে এই জায়গাটি সবচেয়ে উপেক্ষিত থেকেছে এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক অপুষ্ট ও নিরক্ষর মানুষের দেশ হিসাবে ভারত পরিগণিত হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের অর্ধশতাব্দী পরেও এই কলঙ্ক আমরা বহন করে চলেছি। দেশবাসীর স্বাস্থ্যের চিত্রই এই সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়। স্বাস্থ্যের প্রথম সূচনা মাতৃত্ব দিয়ে। যার গর্ভে নতুন জীবন অঙ্কুরিত হয়। সেই মাতৃত্বের চেহারা স্বাস্থ্যবিধিমতে বড়োই করুণ। এ দেশে মায়েদের অপুষ্টির সঙ্গে তাঁদের কায়িক শ্রমের বাধ্যতা শিল্পোন্নত দেশের মায়েদের তুলনায় দাসপ্রথা সমাজের সামিল। মাতৃত্বের এই নগ্ন চেহারা নিরসনে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা শুধুমাত্র লজ্জাকরই নয়, ঘৃণার কারণও বটে। এই চেহারার সত্যতা প্রমাণে একটি পরিসংখ্যানই যথেষ্ট--- আমাদের দেশে প্রসবকালে মায়েদের মৃত্যুর হার শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় একশো গুণেরও বেশি। আমাদের এই প্রজাতন্ত্রের দেশে এ অবহেলা শুরু হয় মেয়েদের জন্মকাল থেকেই। তাই শিশুকন্যার জন্মদান হয় অবাঞ্ছিত। এমনকী পরিবারের অভিশাপ বলে স্বীকৃত। এই উপেক্ষা নিয়েই মেয়েরা বড়ো হয় পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। এরাই অপুষ্টি ও অশিক্ষার প্রধান শিকার। অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ এবং গর্ভধারণ শুধুমাত্র মায়েদেরই

জীবন বিপন্ন করে-না, করে গর্ভজাত ও নবজাত শিশুরও। সে কারণে শিশুমৃত্যুর হার ভারতে এখনও হাজারে ষাটের কাছাকাছি।

আকাশের অর্ধেক এখনও অন্ধকার। আকাশের অর্ধেক নারী, বাকি অর্ধেক পুরুষ। মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশের অর্ধেকটা আজও বেশ অন্ধকার। তৃতীয় বিশ্বে মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। অবহেলার একটা সীমা আছে। দরিদ্র পরিবারে স্বামীহারা স্ত্রী, নিঃসন্তান বা অবিবাহিত মহিলারা আজও সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ও অবাঞ্ছিত। এই বঞ্চনা শুরু হয় মেয়েদের জন্মকাল থেকে। কন্যা ভ্রূণহত্যা দিয়ে যার শুরু। অপুষ্টি, অশিক্ষার প্রধান শিকার শিশুকন্যারাই। অথচ এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে ভারত স্বপ্ন দেখে আসন্ন শতাব্দীতে জাতির উন্নয়নের ভবিষ্যৎ।

জীবিকার প্রশ্নগুলি জাতীয় বিতর্কে স্থান পায়। কিন্তু নারীশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির যতটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল সেখানে খামতি থেকে গেছে। জনগণও এ ব্যাপারে খুব বেশি সোচ্চার বলে মনে হয় না। এটাই স্বাস্থ্যপ্রেমীদের কাছে এক বিরাট কেন?

ভূমিকায় উল্লেখিত নারীস্বাস্থ্যের চিত্র কতটা বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করার অবশ্য প্রয়োজন আছে। নারীদের স্বাস্থ্যের বিশদ পর্যালোচনাই এই সত্যতার বিচার করবে। মেয়েদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে আসে সেগুলি হল— সমাজে নারী-পুরুষের অনুপাত অর্থাৎ সমাজে প্রতি এক হাজার পুরুষের বিপরীতে কতজন নারীর উপস্থিতি বিদ্যমান। ছেলেমেয়ে দু-জনের প্রতি সমান যত্ন নিলে সমাজে পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যা বেশি হয়। যেমন ইউরোপে প্রতি হাজার পুরুষে নারীদের সংখ্যা ১০২২। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৯৩৪ জন। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রও শ্লাঘার নয় (৯৩৩)। হরিয়ানা ও পাঞ্জাব অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হলেও এই দুই প্রদেশের নারীদের সংখ্যার অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে বেশ কম। কেরালাই একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে নারীদের সংখ্যা হাজারের বেশি। মনে রাখতে হবে, কেরালায় নারী-সাক্ষরতার হার ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ।

আমাদের দেশে প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুর ঘটনা এখনও অস্বাভাবিকভাবে খুবই বেশি। শিল্পোন্নত দেশে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার যেখানে মাত্র তিনেরও কম সেখানে ভারতে মায়েদের মৃত্যুর জাতীয় গড় ৩০১। ভিয়েতনামে এই

হার ১১০, যে দেশ দীর্ঘ ৫০-৬০ বছর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই হার উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি (৫১৭), পশ্চিমবঙ্গের চিত্রও দুঃখজনক (১৯৪)। গর্ভাবস্থায় যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, ডায়াবিটিস, রিউমাটিক হার্টের রোগ, মৃত্যুর সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। গ্রামে শতকরা ৮০ শতাংশ এবং শহরে প্রায় ৪০ শতাংশ প্রসব, অদক্ষ ধাইয়ের ওপর নির্ভরশীল। মায়েদের মৃত্যুর জন্য প্রধানত দায়ী--- মেয়েদের দীর্ঘদিনের অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পুষ্টির অভাব ছাড়াও অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ ও সন্তান ধারণ এবং রুগ্‌ণ শরীরে বছর বছর সন্তান প্রসব। নারীশিক্ষার হার (জাতীয় গড় আনুমানিক ৫৪ শতাংশ, তপশিলি জাতি ও জনজাতির মধ্যে ৪০ শতাংশ) কম থাকার দরুন, মায়েদের প্রসবজনিত মৃত্যু, শিশুমৃত্যু, ও বধূহত্যার হারও বেশি। দারিদ্র্যের কারণে যেমন শিশুকন্যাদের স্কুলে না পাঠিয়ে গৃহস্থালির কাজে লাগানো হয়। সেখানে মেয়েদের ওপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা বিরল নয়। যে সকল মেয়েরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে স্কুলে যায় সেখানেও সমস্যা। অনেক জায়গায় পুরুষ শিক্ষকেরা অনেকাংশে যৌন নিগ্রহের জন্য দায়ী।

বাজারই না কি আদর্শ, যাতে প্রতিটি মানুষের উৎকর্ষ বাড়বে। এই নীতি নিয়েই বাজারে নেমে পড়েছে দেশিবিদেশি ব্যবসায়ী, সংবাদ মাধ্যম, বিজ্ঞাপন এবং দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। তাই স্বাস্থ্যও পণ্য হিসেবে হাজির হয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার মতো গজাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে রুগিদের ওপর চার্জ নেওয়া শুরু হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ। যে দেশে ৮০ শতাংশই গরিব সে দেশে অনিয়ন্ত্রিত বাজারের খেলা সাধারণ মানুষকে কী দুর্দশায় ফেলতে পারে তার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি উদাহরণ আফ্রিকার জায়েরির আমদুবেলা হাসপাতাল। ১৯৮৫ সালে ওই হাসপাতালে রুগিদের জন্য চার্জ নেওয়া শুরু হয়। তাতে দেখা যায় প্রসূতিবিভাগে মায়েদের উপস্থিতি ৬৫ শতাংশ কমে যায় এবং পরবর্তী সময়ে মায়েদের মৃত্যুও বেড়ে যায়।

ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি হাসপাতালে রুগিদের থেকে ফি নেওয়া শুরু হয়েছে এবং রুগিদের ওষুধ কিনতে হচ্ছে। এর পরিণতি কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পরিবারের চিকিৎসার জন্য সরকার যদি দায়িত্ব না নেয় তা হলে আকাশের অর্ধেক অন্ধকারই থেকে যাবে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। দেশবাসীর আশি শতাংশই বাস করে গ্রামে। প্রযুক্তির

অভাবে অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রমই গ্রামবাসীদের জীবিকার একমাত্র উপায়। জীবিকার আয় দিয়ে কোনও রকমে প্রাণ ধারণ করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অর্ধাহার, অনাহার তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয় অপ্রতুল স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব তখন গ্রামবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা। এর ফলশ্রুতি জলবাহিত বিভিন্ন রোগের মহামারী।

ভারতরাষ্ট্র দেশবাসীর স্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নয়নে কোনও উদ্যোগই নেয়নি তা বলা চলে না। তবে যে পরিমাণ অর্থ ও আন্তরিকতার প্রয়োজন ছিল তাতে যে ঘাটতি আছে তা বলাবাহুল্য। ১৯৪৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে যেমন ব্রিটিশ রাজত্বকালে ১৯৪৩ সালে ভোরা কমিটি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬২ সালে মুদালিয়র কমিটি, ১৯৬৩-তে চাড্ডা কমিটি এবং ১৯৭৫ শ্রীবাস্তব কমিটি ইত্যাদি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে এবং অল্পবিস্তর কার্যকর হয়েছে। এর সঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন পরিকল্পনার সংযুক্তি ঘটেছে। এতে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কিছুটা কমাতে সাহায্য করেছে। বিশেষকরে গুটিবসন্তের সংক্রমণ নির্মূল হয়েছে। পোলিয়ো-র সংক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার কাজ বিশ্বব্যাপী চলছে। অন্যান্য সংক্রমণের মধ্যে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি ব্যাধির নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চলছে। মা ও শিশুকল্যাণে ধাপে ধাপে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেমন 'অঙ্গনওয়ারি'-র মাধ্যমে কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের এবং ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য পুষ্টির সংস্থান ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। এছাড়াও অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব, আয়োডিনের অভাব নিরসনে গৃহীত হয়েছে ভিটামিন 'এ' ও আয়োডিনযুক্ত লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা। কিন্তু সামাজিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দাপটে দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতিতে আশানুরূপ ফল মেলেনি। আজ সর্বজনস্বীকৃত নারীশিক্ষা শুধুমাত্র মেয়েদেরই সচেতন করে না সঙ্গে জন্মহার ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে। ভারতে একমাত্র কেরালা রাজ্যই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যকে পৃথক করে দেখা সমীচীন নয়। দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এই যুগল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পঞ্চাশ বছরের এই মূল্যায়নের পর প্রশ্ন আসতেই পারে কেন এই দুরবস্থা? এখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবশ্য দায়ী করা যেতে পারে। এর সঙ্গে অবশ্যই রাজনৈতিক দল ও সরকারের কর্মসূচি। ২৬শে জানুয়ারিতে লালকেল্লার

রাজপথে যেভাবে অস্ত্রের সম্ভার প্রদর্শিত হয় এতেই বোঝা যায় রাষ্ট্রের কোষাগারের আসল ধন কোন কাজের জন্য বরাদ্দ করা থাকে। যে রাজনৈতিক দলেরা ধনিক শ্রেণির প্রতিভূ তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা অনুচ্চারিত থাকবে তা অনুমেয়। অস্বীকার করার উপায় নেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চিত্র এখনও দুঃখজনক। ২০০৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আশার কথা অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দুটি প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে যার প্রথম— নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্যবাসীর আশি শতাংশকে সাক্ষর করে তোলা এবং দ্বিতীয়, শিশুমৃত্যুর হারকে ষাট থেকে চল্লিশে কমিয়ে আনা। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনের গড়িমসির পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক অভীষ্টে পৌঁছনো অবশ্যই জরুরি। এ কাজ যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল। রাজ্যবাসীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে একে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

সবশেষে যেটা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন দেশবাসীর জীবনের মান উন্নয়ন ও উৎকর্ষের জন্য চাই দেশবাসীর সচেতনতা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা। স্বাস্থ্যের সক্ষমতা অর্জনে ইষ্টনাম জপের মতো তাদেরই জপ করতে হবে— "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

শিশুমৃত্যু ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার

	নারী শিক্ষার হার শতকরা হিসেবে	শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজার	মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ শিশু জন্ম দিতে গিয়ে
ইউরোপ	প্রায় ১০০	০৩	২ বা ৩
ভারত	৫৪	৫৮	৩০১
পশ্চিমবঙ্গ	৬০	৪০	১৯৪
কেরালা	৮৮	১১	১১০

উৎস : W.H.O, U.N.I.C.E.F. 2003
Sample Registration System,RGI Office (2004)